বাংলা ছোটগল্প ও গল্পকার

ড. বিজিত ঘোষ

পুনশ্চ

কোন্নগর, নবগ্রাম, হীরালাল পাল কলেজের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, আমার একান্ত স্নেহের প্রিয় অধ্যাপক, ড. সুব্রত চ্যাটার্জী ও ঐ কলেজের স্নাতকোত্তর বাংলা বিভাগের আমার স্নেহের সকল ছাত্র-ছাত্রীকে

এবং

আমার একান্ত স্নেহের এম. ফিল. ছাত্রদের—রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয় (বেলুড় মঠ)-এর

সেখ সামসুল আরেফিন, গুলশন, অমিত, অর্জুন, পার্থ, বিশ্বজিৎ, মোজাফ্ফার (২০১২-১৩); শৌভিক, পার্থসারথি, অরিন্দম, সুখেন্দু, সৌমিত্র, সুদীপ (২০১৩-১৪); রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির (বেলুড় মঠ)-এর আমার একান্ত স্নেহের এম. ফিল ছাত্রদের

চিরঞ্জিত, সুরজিৎ, দেবাশিস, দীপায়ন, ব্রতজিৎ, সত্য, আনন্দ, রাহুল, সফিকুল, মধুসূদন, সৌরভ, পুণ্য, সুশীল, সমরেশ, সুদীপ, রঞ্জিত, মনসা, বিনয়, অনুপ (২০১৫-১৬);

রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির-এর ‘‘স্বামী বিবেকানন্দ রিসার্চ সেন্টার’’ থেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পি.এইচ.ডি ডিগ্রির জন্য আমার কাছে গবেষণারত ‘রিসার্চ স্কলার’ (JRF) সুবোধ মণ্ডল ও অর্জুন বণিক-কে;

নিত্য শুভার্থী, ‘স্যার’,

সূচিপত্র

গল্পকার	গল্প	পৃষ্ঠা
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়	দেবী	১০
১৮৭৩-১৯৩২	মাতৃহীন	২৫
	ফুলের মূল্য	৩৩
	প্রণয় পরিণাম	৪২
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	ডাইনী	৫৬
১৮৯৮-১৯৭২	নারী ও নাগিনী	৬৬
	প্রতিমা	৭১
	ইমারত	৭৭
প্রেমেন্দ্র মিত্র	পুন্নাম	৮৬
১৯০৪-১৯৮৮	সংসার সীমান্তে	৯৬
	স্টোভ	১০৮
	সাগর সংগমে	১১৬
মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়	সরীসৃপ	১৩৬
১৯০৮-১৯৫৬	শিল্পী	১৭৩
	দুঃশাসনীয়	১৮২
	কুষ্ঠরোগীর বৌ	১৯৫
সোমেন চন্দ	দাঙ্গা	২০৮
১৯২০-১৯৪২	সংকেত	২১২
	বনস্পতি	২২১
	ইঁদুর	২৩৮
বিমল কর	বরফ সাহেবের মেয়ে	২৪৮
১৯২১-২০০৩	জননী	২৬১
	আত্মজা	২৬৭
	সুধাময়	২৭৯

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জন্ম : ১৮৭৩; ৩ ফেব্রুয়ারি; বর্ধমানের ধাত্রীগ্রামে। তাঁর পৈতৃক নিবাস হুগলি জেলার সুরুল গ্রামে। তিনি পাটনা থেকে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরে ব্যারিস্টারি পাশ করে কিছুদিন আইন ব্যবসায় নিযুক্ত থাকেন। ১৯১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। বিচিত্র অভিজ্ঞতার মানুষ ছিলেন তিনি। বিলাতে ব্যারিস্টারি পড়তে যাওয়ার আগে তাঁকে কিছুদিন কেরাণীর চাকরী করতে হয়। ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে তিনি নানা জায়গায় চাকরি সূত্রে যান। যেমন, দার্জিলিং, রংপুর, গয়া এবং শেষ পর্যন্ত কলকাতা। বিচিত্র মানুষের সঙ্গে চাকরি সূত্রে তাঁর পরিচয় হয়; যা তাঁর ছোটগল্পের বিভিন্ন চরিত্র সৃষ্টিতে বিশেষ কাজে লাগে।

বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে তিনি যুক্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল 'মানসী ও মর্মবাণী' পত্রিকার সহসম্পাদক ছিলেন প্রভাতকুমার। ছাত্রাবস্থাতেই প্রভাতকুমার 'ভারতী' পত্রিকায় লেখক রূপে যোগদান করেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে 'অভিশাপ' (ব্যঙ্গকাব্য) নামে এক কাব্য রচনা করে তিনি কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথই প্রভাতকুমারকে ফিরিয়ে আনেন কথাসাহিত্যের জগতে। কিছু কিছু গল্প-উপন্যাসের কাহিনীও জোগান দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রভাতকুমারকে। ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'রাধামণি দেবী' ছদ্মনামে 'পূজার চিঠি' শীর্ষক গল্প লিখে 'কুন্তলীন পুরস্কার' পেয়েছিলেন প্রভাতকুমার।

প্রভাতকুমারের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'নবকথা'-র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রভাতকুমার লিখেছেন, 'শ্রীবিলাসের দুর্বুদ্ধি' আমার সর্বপ্রথম গল্প রচনা; যদিও গল্পটি প্রথম ছাপা হয় কিছু পরে, ১৩০৫ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রদীপ' পত্রিকায়, ইতিমধ্যে তার 'একটি রৌপ্যমুদ্রার জীবনচরিত' নামে গল্পটি প্রকাশিত হয়। প্রভাতকুমারের গল্পগ্রন্থের সংখ্যা মোট বারো। তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা ১৪টি। আর গল্পের সংখ্যা শতাধিক। তাঁর গল্প গ্রন্থগুলির মধ্যে রয়েছে—'নবকথা' (১৮৯৯), 'দেশী ও বিলাতী' (১৯০৯), 'গল্পবীথি' (১৯১৬), 'পত্রপুষ্প' (১৯১৭), 'গহনার বাক্স ও অন্যান্য গল্প' (১৯২১), 'হতাশ প্রেমিক ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৬), 'যুবকের প্রেম ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৮), 'নূতন বউ' ও অন্যান্য গল্প' (১৯২৯), 'জামাতা বাবাজী ও অন্যান্য গল্প' (১৯৩১)।

মৃত্যু : ১৯৩২, ৫ এপ্রিল।

॥ দেবী ॥

গল্প – বিশ্লেষণ

একশো বছরের বেশি প্রাচীন একটি কাহিনিকে গল্পকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পের বিষয় হিসেবে গ্রহণ করেছেন এখানে।

পৌষমাসের দীর্ঘ রজনী আর যেন কাটতে চায় না কিছুতেই। এই সাধারণ বিবৃতিমূলক সত্য সংবাদটি দিয়ে গল্পের সূচনা। এ দীর্ঘ রজনী কি কেবল বাহ্য প্রকৃতির বর্ণনা-ই? মনুষ্যজীবনের চরম খারাপ সময়ও তো কালরাত্রির মতো বিলম্বিত ও বিড়ম্বিত হয়ে আর পোহাতেই চায় না। গল্পের সূচনাতে কি উমাপ্রসাদের জীবনের তেমন কোনো ভয়ংকর পরিণতির ইঙ্গিত রেখে গেলেন গল্পকার?

ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় উমাপ্রসাদ লেপের ভেতর সন্ধান করলেন স্ত্রীকে। পেলেন না। কোথায় গেলেন তার নববধূ ষোড়শী পত্নী? বিছানায় একপ্রান্তে গুটিসুটি হয়ে স্ত্রীকে ঘুমোতে দেখে বড়ো মায়া হল উমাপ্রসাদের। সাবধানে স্ত্রীর গায়ে ভালো করে লেপটি বিছিয়ে দেয় উমাপ্রসাদ।

মাত্র কুড়ি বছরের যুবক উমাপ্রসাদ। তখনকার দিনে এমন কম বয়সেই বিবাহ হত। স্ত্রীও তার ষোলো বছরের সদ্য যুবতী। মাতৃহীন উমাপ্রসাদের পিতা শ্রীকালীকিঙ্কর রায় মহাশয় 'পরম পণ্ডিত, পরম ধার্মিক, নিষ্ঠাবান শক্তি উপাসক, গ্রামের জমিদার, সম্মানের সীমা নাই।'

পাড়া-প্রতিবেশীদের বিশ্বাস, কালীকিঙ্কর একজন প্রকৃত সিদ্ধপুরুষ। তাই গ্রামের প্রতিটি মানুষ তাঁকে দেবতার মতো শ্রদ্ধা করে। অনেকের স্থির বিশ্বাস, স্বয়ং কালীকিঙ্কর 'আদ্যাশক্তির বিশেষ অনুগৃহীত।' পরম নিষ্ঠাবান শক্তির উপাসক তাই পুত্রের নাম রাখেন উমাপ্রসাদ। কালীমাতার সন্তান। তিনি নিজেই কালীকিঙ্কর। শক্তি-মায়ের পদানত ভৃত্য।

কুড়ি বছর বয়সি আধুনিক উমাপ্রসাদের মধ্যে পিতার মতো ঐকান্তিক ভক্তি না থাকাই স্বাভাবিক। তাই বুঝি সে সংস্কৃত ছেড়ে শখ করে পারস্যভাষা শিক্ষায় আগ্রহী হতে পারে।

মিষ্টিমধুর দাম্পত্য সুখের মধ্যে উমাপ্রসাদের দিন বেশ অতিবাহিত হচ্ছিল। 'উমাপ্রসাদ আপনার নবীন জীবনে সম্প্রতি নবপ্রণয়ের মাদকতা অনুভব করিতে আরম্ভ করিয়াছে।' বছর ছয়েক আগে তার বিবাহ হয়েছে। তখন সে মাত্র ১৪/১৫ বছরের কিশোর। আর তার স্ত্রী দয়াময়ী তখন নিতান্তই বালিকা। বড়োজোর বছর দশেক বয়স তার। এখন দয়াময়ী ষোলো। উমাপ্রসাদের কুড়ি।

দাম্পত্য-মধুরতার এই তো ঊষাকাল। পত্নীর সঙ্গে নবরূপে ঘনিষ্ঠতার সেই তো সূচনা-লগ্ন। মাহেন্দ্রক্ষণ। সেই দাম্পত্য-মধুরিমার মিষ্টি-সুন্দর ছবি এঁকেছেন গল্পকার। 'স্ত্রীর গাত্র আবৃত করিয়া উমাপ্রসাদ তাহার গণ্ডস্থলে একখানি হাত রাখিল—দেখিল সে স্থান শীতে শীতল হইয়া গিয়াছে। অত্যন্ত ধীরে ধীরে পত্নীর মুখ চুম্বন করিল।'

উমার আদরে ঘুম ভেঙে যায় দয়ার। তবু যেন কীসের আশায় চুপচাপ শুয়ে থাকে সে। উমা বুঝতে পারে স্ত্রী তার জেগেই গেছে। মৃদুস্বরে ডাকে উমা। সেই দু'এক কথার অর্ধোচ্চারিত অস্ফুট সংলাপের মধ্যে লুকিয়ে থাকে পরস্পরের প্রতি গভীর টান-ভালোবাসা-আদর-মায়া। স্বাভাবিক আসক্তির লজ্জারুণ-আভা।

দয়া বলিল—'কি?' 'কি' টা খুব দীর্ঘ করিয়া বলিল।

'তুমি বুঝি জেগে রয়েছ?'

দয়া ঢোক গিলিয়া বলিল—'না ঘুমুচ্ছিলাম।'

উমাপ্রসাদ আদর করিয়া স্ত্রীকে বুকের কাছে টানিয়া আনিল।

বলিল—'ঘুমুচ্ছিলে ত উত্তর দিলে কে?'

দীর্ঘায়িত 'কি' উচ্চারণের মধ্যে ঘুমজড়ানো আলস্য, আদর প্রাপ্তির তৃপ্তি, আরও আদরের আকাঙ্ক্ষা—সব মিলেমিশে মনে হয় 'মধুর তোমার শেষ যে না পাই।' এমন মিষ্টি মধুর প্রেমের ছবি অঙ্কনে প্রভাতকুমারের আন্তরিক দরদি কলম বারবারই চূড়ান্ত দক্ষতা দেখিয়েছে। সদ্যযুবা স্বামীর আদরে ষোড়শীর ঘুম-ভাঙানোর চিরন্তন মধুর দাবিকে এখানে অনবদ্য মুনশিয়ানায় বিশ্বস্ত করে তুলেছেন প্রভাতকুমার।

এমন নবদাম্পত্যে কত অকারণ কথা, মিছিমিছি তর্ক, দুষ্টুমি ফুল হয়ে ফোটে; এখানে সেটাই মেলে ধরেছেন গল্পকার। বরের আবদারে দয়াকে বলতে হয়, 'আগে ঘুমুচ্ছিলাম, এখন জেগে উঠলাম।' এই কথাটিই শুনতে চাইছিল উমা। 'এখন' শব্দের পিঠে চড়ে মিষ্টি খুনসুটি করতে ইচ্ছে হয় উমার, শুধু ইচ্ছেই কেন; নব-দাম্পত্যে স্ত্রীর মুখ থেকেই কিছু শোনার আকাঙ্ক্ষাও যে মনে মনে বড়ো প্রবল হয়ে ওঠে। এমন রোমান্টিক দৃশ্য ও সংলাপ রচনায় প্রভাতকুমার সিদ্ধহস্ত।

উমাপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করল—'এখন কখন? ঠিক কোন্ সময়?'

উমা ভারি দুষ্ট। 'কোন সময় আবার? সেই তখন'

'কখন?'

'যাও আমি জানিনে।' বলিয়া দয়া স্বামীর বাহু পাশ হইতে মুক্ত হইবার চেষ্টা করিল। ঠিক কখন জাগিয়াছে, দয়াও কিছুতে বলিবে না, তাহার স্বামীও কিছুতে ছাড়িবে না। কিয়ৎক্ষণ মান অভিমানের পর দয়ার পরাজয় হইল। উত্তর দিল, 'সেই তখন তুমি' বলিয়া থামিল। 'আমি কি করলাম?' দয়া খুব তাড়াতাড়ি করিয়া বলিল—'সেই তখন তুমি আমায় চুমু খেলে, —হল।'

উমাপ্রসাদ-দয়াময়ীর দাম্পত্য-সম্পর্কের বিশ্বাস, সরলতা, মাধুর্য ভালোবাসার সুখী রঙিন ছবি দিয়ে নির্মিত হয় গল্পের সূচনাংশ।

রাত্রি তখনও এক প্রহরের বেশি বাকি। নবদম্পতি বাকি রাত বসে কত কথাই যে বলে! সে সব অর্থহীন কথাবার্তা। তাতেই সুখ। আনন্দ। খুশি। তৃপ্তি। মনের শান্তি। পারস্পরিক ভালোবাসায় স্নাত ভালোলাগা অনেক মাথামুণ্ডহীন কথাবার্তার পর উমা দয়াকে জানায়, সে পশ্চিমে যাবে চাকরিতে। দয়ার তাতে বিস্তর আপত্তি। কোন্ দুঃখে জমিদারের ছেলে চাকরি করতে যাবে? স্বামীর আবার দুঃখ কোথায়? অনেক ভেবেচিন্তেও মাথায় আসে না দয়ার। তখন সে ইচ্ছা করে উমাকে আঘাত দিতে বলে, 'তোমার কী দুঃখু? আমি বুঝি মনের মত হইনি।'

প্রিয়তমা উমাপ্রসাদের মনের মতো তো বটেই। দুঃখ তার সেজন্যই। প্রাণপ্রিয় স্ত্রীকে এ সংসারে নিজের মতো করে কতটুকু সময় কাছে পায় উমা? স্ত্রীকে, হয়তো বা পিতার উদ্দেশ্যেই অনুযোগ করে উমাপ্রসাদ।

> আমার দুঃখু তোমাকে নিয়েই বটে। সমস্ত দিন আমি তোমায় পাইনে। শুধু রাত্তিরটি পেয়ে সাধ মেটে না। বিদেশে চাকরি করতে যাব, সেখানে তোমায় নিয়ে যাব, কেমন দুজনে একলা থাকব সারাদিন সারারাত।

বিশ বছরের যুবার পক্ষে তার ষোড়শী পত্নীকে কাছে পাওয়ার এ ইচ্ছে তো সংগত। স্বাভাবিক। কিন্তু উমাপ্রসাদের কপালটাই মন্দ। রাতের শেষ প্রহরে অল্পবয়সি দম্পতি তাদের সাধ-ইচ্ছের কথোপকথন চালায় পরস্পরের সঙ্গে।

চাকরি করলে সেখানে তো সারাদিন একলা থাকতে হবে দয়াকে। উমা চলে যাবে কাছারিতে। উমা জানায়, সে কাছারি থেকে খুব তাড়াতাড়িই ফিরবে। রোজ। প্রিয়তমা গৃহিণীর জন্য।

কিন্তু উমা চাইলেই কি দয়াময়ীকে নিয়ে যেতে পারবে? তার প্রবলপ্রতাপ শক্তিসাধক পিতা কালীকিঙ্কর আছেন। আদরের কনিষ্ঠা পুত্রবধূকে কি তিনি ছাড়বেন? তাছাড়া 'খোকা'-কে ছেড়ে বেশিদিন কোথাও গিয়ে থাকেতও পারবে না দয়াময়ী। খোকা তার প্রাণের থেকেও প্রিয়। খোকা তার নয়নের মণি। খোকা! উমাপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ সহোদর তারাপ্রসাদের একমাত্র সন্তান। শুধু দয়াময়ীর প্রাণ নয়; খোকা এ পরিবারের সকলের কাছে বড়োই আদরের ধন। কারণ, 'এই পরিবারে খোকা-রাজার সিংহাসন বহুকাল শূন্য ছিল, তাই খোকার বড় আদর; খোকা বাড়িশুদ্ধ সকলের চক্ষের মণি। খোকার মা হরসুন্দরী, তাঁর তো গরবে আর মাটিতে পা পড়ে না।' যদিও হরসুন্দরী নয়; খোকা সর্বক্ষণ থাকে তার স্নেহময়ী কাকিমা দয়াময়ীর কাছেই। সেই খোকাকে ছেড়ে কোথাও গিয়ে শান্তি পাবে না দয়াময়ী। এমনকি উমাপ্রসাদের কাছে থেকেও। তবু প্রথমে সে কথা বলে না দয়া। বলে, এখান থেকে তাকে যেতে দেবে না কেউ। উমা জানায়, দয়া যখন বাপের বাড়ি যাবে, সেখানে গিয়ে চুপি চুপি এসে বউকে সঙ্গে নিয়ে সে চলে আসবে নতুন আসন্ন চাকরিস্থলে।

উমাপ্রসাদের পক্ষে পিতার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এমন প্রস্তাব দেওয়ার কথা কল্পনাও করা যায় না। এবার দয়া তার মনের কথাটি অকপটে বলে ফেলে স্বামীকে। 'খোকাকে ফেলে কি অনেক বছর আমি বিদেশে থাকতে পারব?' তা শুনে উমাপ্রসাদ তাদেরও খোকা হওয়ার

প্রসঙ্গ তুললে 'দয়ার ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে কর্ণমূল পর্যন্ত লজ্জায় রাঙা হইয়া উঠিল। কিন্তু অন্ধকারে তাহা কেহ দেখিতে পাইল না।'

স্বামী-স্ত্রীর কথোপকথনে ভোর হয়ে এল। তখনও খোকা এ ঘরে না আসায় একটু অবাকই হয় দয়া। প্রতিদিন ভোররাত্রে খোকার কাকিমার কাছে আসা চাই-ই। কখনও কোনোদিন এর অন্যথা হয়নি।

শক্তিসাধক কালীকিঙ্কর। শক্তি-মায়ের প্রতি তাঁর অচলা ভক্তি ও বিশ্বাসবশতই সম্ভবত সন্তানদের নাম রেখেছেন মায়ের নামানুসারেই। জ্যেষ্ঠপুত্র তারাপ্রসাদ। কনিষ্ঠ জন উমাপ্রসাদ। পুত্রবধূর দয়াময়ী নামটিও কি স্বয়ং কালীকিঙ্করের দেওয়া?

নিষ্ঠাবান সিদ্ধপুরুষ কালীসাধক কালীকিঙ্করের পূজাহ্নিক সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য স্বেচ্ছায় সানন্দে করে দয়া। কালীকিঙ্করের ও-সব কার্যে দয়াময়ী ছাড়া অন্য কারোর স্পর্শ করারও অধিকার নেই। যদিও বাড়িতে দাসদাসীর অভাব নেই। কালীকিঙ্করের পূজা বিষয়ক সমস্ত কাজ এবং সে কার্যে ও অন্যান্য কাজে সারাদিন ব্যস্ত থেকেও এক মুহূর্তের জন্য খোকাকে তার চোখের আড়াল করার উপায় ছিল না। উভয় তরফ থেকেই। খোকা ছাড়া কাকিমার চলে না, আর কাকিমা ছাড়া খোকা তো কিছু জানেই না।

> কাকীমা গা মুছাইয়া না দিলে খোকা গা মুছে না, কাকীমা কাজল পরাইয়া না দিলে কাজল পরে না, কাকীমার কোলে ভিন্ন অন্য কোথাও শুইয়া খোকা দুধ খায় না। খোকার বিছানায় তার কাকীমা অনেক রাত্রি অবধি থাকিয়া ঘুম পাড়াইয়া আসে, ভোর রাত্রে ঘুম ভাঙ্গিলেই খোকা 'কাকীমা' বলিয়া কান্না জুড়িয়া দেয়।

খোকার এই সর্বক্ষণ কাকীমা নেওটাপনা আর বাড়াবাড়ি রকমের অন্যায় আবদারের জন্য মায়ের কাছে চড়-চাপড়ও তার কপালে কম জোটে না। তাতে হিতে বিপরীত হয়। কাকীমার কাছে যাওয়ার জন্য খোকার কান্না আরও দশগুণ বেড়ে যায়। অগত্যা হরসুন্দরী ছেলেকে কোলে নিয়ে ক্রোধসহ নিদ্রাতুর অবস্থায় দয়াময়ীর শয়নকক্ষে এসে দ্বারে ধাক্কা দেয়।

> ছোট বউ, ও ছোট বউ এই নে তোর খোকাকে। বলিয়া দুয়ার খুলিবার অপেক্ষা না রাখিয়াই, খোকাকে মাটিতে বসাইয়া প্রস্থান করেন। দয়া প্রায়ই জাগিয়া থাকে, না থাকিলেও খোকার ক্রন্দনে শীঘ্রই জাগিয়া উঠে, ছুটিয়া আসিয়া খোকাকে বুকে করিয়া লইয়া যায়, 'কে মেরেছে কে মেরেছে' বলিয়া কত সোহাগ করে। মাথায় শিয়রে পানের ডিবায় কোনওদিন কদমা, কোনও দিন বাতাসা, কোনও দিন নারকেল নাড়ু সঞ্চিত থাকে, তাই খোকা ভক্ষণ করে, তাহার পর নিশ্চিন্ত হইয়া কাকীমার কোলে শুইয়া ঘুমাইয়া যায়।

আজ সেই খোকাকে প্রাতঃকালে না দেখে দয়ার উৎকণ্ঠা বেড়ে যায়। 'বাছার অসুখ বিসুখ করেনি ত?' মনের মধ্যে নানা দুঃশ্চিন্তা উঁকি দেয় তার। স্নেহভাজনের প্রতি অধিক দুর্বলতায়; হয়তো সেই সঙ্গে স্বামীর পশ্চিমে চাকরি করতে যাবার কথা শুনেও। সবমিলে দয়াময়ীর মনটা আজ একটুও ভালো নেই। বড়োই উদ্বিগ্ন। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত।

বাইরে তখনও চাঁদ ডোবেনি। সকালের কিছুটা বিলম্ব আছে। শীতের হিমেল বাতাস ঘরের মধ্যে জানালা দিয়ে হুহু করে প্রবেশ করে। দয়ার মনটাও যে কেন জানি না এই শেষ